যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৭ এপ্রিল ২০১৭

কলকাতা

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

উত্তর কলকাতার বাড়িগুলো বহুবছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। ইমারতগুলোর প্রতিটা ইটের খাঁজে লুকিয়ে আছে ইতিহাসের পুরু স্তর। সিভিলাইজেশনের এফেক্ট সর্বত্র। তবু পলেস্তরা খসে পড়া বাড়িগুলো আগের মতোই দাঁড়িয়ে। এই যান্ত্রিক সভ্যতায় অটো-ট্যাক্সি-স্কুটারের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটছে সবাই। সভ্যতা যত এগোচ্ছে, ততই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে প্রকৃতি। হারিয়ে যাচ্ছে পাখিদের আশ্রয়স্থল। পায়রার ঝাঁকের কেউ আশ্রয় নিচ্ছে হাইটেনশন ইলেকট্রিকের তারে, কেউ-বা পেভমেন্টের একপাশে। সময় বলবে এই অগ্রগতি কতটা ইতিবাচক...

ফোটো: **সুজিত জানা** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

দেবশঙ্কর হালদার (অভিনেতা)

কলকাতা নিয়ে স্বল্প পরিসরে বলা খুব মুশকিল। কলকাতার কত স্মৃতি। কলকাতা আমার জন্মস্থান। কলকাতার অলিতে-গলিতে, রাস্তাঘাটে আমার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। কলকাতাকে আমার ভারি অদ্ভুত লাগে। এখানে যেমন ভালোবাসা আছে, আন্তরিকতা আছে, তেমনি আবার হিংসা, বিদ্বেষও রয়েছে। সবথেকে অদ্ভুত লাগে এখানে কেউ কাউকে শত্রু ভাবলেও তার খোঁজখবর কিন্তু ঠিক রাখে।

আসলে কলকাতার মধ্যে যে টান, ভালোবাসা সেটা আমি অন্য কোনও শহরে পাইনি। কলকাতার একটা আলাদা মাধুর্য তো রয়েছেই। সেটা আগেও ছিল, এখনও আছে। কলকাতার মধ্যে যে উদারতা রয়েছে, সেটা অন্য কোথাও দেখতে পাই না।

এখানে দেখবার কত জিনিস, কত ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায়। কলকাতা কলকাতাই। আমাদের মতো শিল্পীদের জন্য অনুপ্রেরণাও বটে। তবে কলকাতার রাস্তাঘাট আরও একটু পরিষ্কার-পরিছন্ন হলে ভালো লাগবে।

আমার একটা জিনিস খুব মনে হয়, আমি নিজে নর্থ কলকাতার ছেলে, এখানকার ঘর-বাড়িগুলো বেশ পুরনো, অনেক বাড়ি দীর্ঘদিন রংহীন হয়ে পড়ে রয়েছে। ভাবি কোনও একটা সকালে উঠে যদি দেখি সব বাড়িতে রং হয়ে গেছে, কী ভালোই না লাগবে। একটা ক্যানভাসের মতো লাগবে। এটা আমার একটা স্বপ্ন। হয়তো স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যাবে। তবু দেখতে ক্ষতি কী!

কলকাতার প্রতি আমার আরও একটা ভালো লাগা হল এই শহরে আধুনিকতার যেমন ছোঁয়া রয়েছে, তেমনি আবার আদিমতাও রয়েছে। এমনটা অন্য কোথাও কিন্তু নেই। কলকাতা খুব বেশি আধুনিক হোক সেটা আমি চাই না। তাহলে মানুষগুলো বদলে যাবে। কলকাতার মানুষের মধ্যে আজও একে অপরের জন্য যে টান, সহানুভূতি রয়েছে সেটা যেন আগামিদিনেও থাকে।

চলতে চলতে কলকাতা দেখা: এসপ্ল্যানেড টু গালিফ স্ট্রিট

বাণিজ্যে বসতি কলকাতা

পান্থজন

পথে পথে চলার একটা ধর্ম আছে, উদ্দেশ্য আছে। চলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত ধরা পরে পথ ও পথিকের জীবনধারার বৈচিত্র। দুচোখ ভরে সেই বৈচিত্র দেখতে দেখতেই চলার পথ পরিষ্কার হয়। খাদ্যরসিকদের রসনা তৃপ্তির খবর দিয়ে আবারও চলতে শুরু করলাম। পায়ে পায়ে এসে পড়েছি চিৎপুর আর মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থলে, ট্রামলাইনের ধারে। রাস্তার ওপার থেকে পুনরায় আবার এগোব। যেখান থেকে আমার চলা শুরু হল, সেখানে চারিদিকে ফলের বাজার। হরেকরকম মরশুমি ফলের পসরা সাজিয়ে বসে আছেন বিক্রেতারা। আরও কিছুটা সোজা এগোলেই ডানদিকে কলকাতার অন্যতম ফলের আড়ত। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি ট্রাক। এখান থেকে শহরের উপকণ্ঠে এবং রাজ্যের নানান অংশে ফলের জোগান দেওয়া হচ্ছে। ফলের বাজার থেকে চোখ ঘোরাতেই দেখলাম এক অদ্ভুত জিনিস। বৈচিত্রময় রঙের বস্তুটি তৈরি হয়েছে বাঁশের কঞ্চি কেটে। জিজ্ঞেস করে জানা গেল অবাঙালি মারওয়াড়ি সম্প্রদায়ের বিয়ে এবং অন্যান্য শুভকর্মে এটি ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও ওইসব দোকানে বিক্রিত হচ্ছে আরও অনেক দ্রব্য যা অনেকটা বাঙালির দশকর্মার মতো। রাস্তার বাঁদিকে এবং ডানদিকে দেখা যাচ্ছে একাধিক সেলাই মেশিনের দোকান। রয়েছে দুগ্ধজাত দ্রব্যেরও কয়েকটি বিপণন কেন্দ্র। পাশাপাশি রয়েছে অজস্র বেডিংয়ের দোকান, সেখানে ঝুলছে রংবেরঙের মশারি, তোষক ইত্যাদি। পরিচ্ছন্ন শয়নের কত-শত আয়োজন। এ সবের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছে এক অতি প্রাচীন জৈন মন্দির।

কলকাতায় অবস্থিত গুটি কয়েক জৈন মন্দিরের অন্যতম এটি। বেলগাছিয়ার পার্শ্বনাথ দিগম্বর জৈন মন্দিরের কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু চিৎপুরে অবস্থিত ১৯০৬ সালে নির্মিত মন্দিরটির কথা বিশেষ শুনিনি। আর্য

সমাজের উদ্যোগেই মন্দিরটি তৈরি হয়। প্রতি বছর এপ্রিল মাসে মহাবীর জয়ন্তীর দিনে এই মন্দির থেকে একটি বড় শোভাযাত্রা বের করা হয়। রবীন্দ্রসরণি, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলাকার স্ট্রিট ও মহাত্মা গান্ধী রোড ঘুরে শোভাযাত্রাটি আবার এখানেই এসে শেষ হয়। এই মন্দির যে জমির ওপর নির্মিত সেটি এক সময় ছিল জনৈক মল্লিকদের মালিকানা। অতীতে নাকি কোনও এক সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই বাড়িতে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে মল্লিকরা এই জমি সমাজকে দান করে দেন মন্দির তৈরির উদ্দেশে। সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ অর্থও দান করেন। খুব ভোর থেকেই এখানে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়। একতলার কুয়ো থেকে জল তুলে তা সামান্য গরম করে নুন দেওয়া হয়। তারপর তা উৎসর্গ করা

এরপর দুইয়ের পাতায়

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৭ এপ্রিল ২০১৭

পুরনো নববর্ষের খোঁজে

নীহারিকা

শ্রীচরণকমলেষু মা,

‘প্রথমেই আপনি ও বাবা আমার নববর্ষের প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আশা করি আপনারা সকলে কুশলে আছেন। আমরা একপ্রকার...।’ এ চিঠি ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের। আজ ১৪২৪। মাঝে দু’যুগেরও বেশি ব্যবধান। পাল্টে গেছে কত কিছু। কলকাতা কি মনে রেখেছে সেসব? নতুন বছর। নতুন আলো। নতুন ভাবনা। নতুন উদ্দীপনা। নতুন গন্ধ। নতুন সুর। সবই নতুন। গায়ে নতুন জামা। হাতে নতুন ক্যালেন্ডার। ঝোলায় নতুন স্বাদের মিষ্টি। সঙ্গে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের আদি অকৃত্রিম সেই আশীর্বাণী, আজও আছে।

উত্তর কলকাতার গিন্নিমা, নতুন বছরে নতুন তাঁতের শাড়ি পরে, পানে ঠোঁট লাল করে, কচিকাঁচা ও হালখাতার নিমন্ত্রণপত্রগুলি সঙ্গে নিয়ে গয়নার দোকান, মাসকাবারি মুদির দোকান, শাড়ির দোকান এমনকী পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গেও নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন। আজও এ-বাড়ির জানালা দিয়ে ও বাড়ির খিড়কিতে পৌঁছে যায় নারকেল নাড়ু, নিমকি, পায়েস, সঙ্গে কুচো চিংড়ির চচ্চরিও থাকে। দক্ষিণ কলকাতার চিত্রটা একটু আলাদা। হালকা এবং পাতলা রঙিন শাড়িতে সুন্দর করে সেজে, খোপায় জুঁইয়ের মালাটি পরিপাটি করে লাগিয়ে কাকিমা চললেন হালখাতা সারতে। সঙ্গে বাড়ির কনিষ্ঠটি। তারও গায়ে নতুন টি-শার্ট আর হাফ প্যান্ট। তার দাবি মেনেই প্রথমে গয়নার দোকান। আলো ঝলমলে দোকানে বহু লোকের সমাগম। শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় চলছে কোল ড্রিঙ্কের সঙ্গে। কেউ কেউ নতুন ডিজাইন দেখতে ব্যস্ত। আবার কেউ হাজার এক টাকা দিয়ে হালখাতায় নাম লেখাচ্ছেন। মধ্য কলকাতা, পূর্ব কলকাতার ছবিটাও খানিকটা এমনই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই চিত্র আজ কতটা বর্তমান? একটা সময় ছিল আমাদের বাড়িতে হালখাতার নিমন্ত্রণপত্র আসত। আজ আর আসে না। ছোটবেলায় হালখাতার মিষ্টি আসত বাড়িতে, আজ তাও আসে না। বাংলা ক্যালেন্ডারের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়। সিডিতে, রের্কডে, টিভিতে, হ্যালো টিউনে, রিং টোনে ‘এসো হে বৈশাখ’ আসে, রবি ঠাকুর এক ঝলক উঁকিও দিয়ে যান, কিন্তু বৈশাখের সেই গন্ধটা নাকে আর পাই না। নববর্ষের বৈঠক, কলেজ স্ট্রিটে নতুন বই প্রকাশ, যাত্রাপাড়ার হাল-হকিকত, কিছুই আর ধরা দেয় না এ পোড়া মনে। সব হারিয়ে গেছে। তবু কালের গর্ভ থেকে ফসিল না হওয়া কিছু কথা জানাই আপনাদের। আমার বিশ্বাস আপনি জানেন, কিন্তু আপনার বাড়ির কিশোরটি, যে পয়লা বৈশাখকে (১লা) একলা বৈশাখ বলে, সে জানে কি হালখাতা কাকে বলে? কেন ওই দিন দক্ষিণেশ্বরে, কালীঘাটে এত ভিড় জমে?

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকানুসারে কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করতেন। কিন্তু হিজরি সন চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় অনেক সমস্যা দেখা দিত। খাজনা আদায়ে শৃঙ্খলা আনার লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তাঁর আদেশানুসারে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌরসন ও আরবি হিজরির ওপর নির্ভর করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম নির্মাণ করেন। ১৫৮৪ সালের ১০ বা ১১ মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হলেও তা কার্যকরী হয় আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকেই। সন গণনার প্রথম নাম ছিল ফসলি সন, পরে পরিচিত হয় বঙ্গাব্দ নামে। আকবরের সময় থেকেই এই নববর্ষ পালন শুরু হয়। তখন থেকেই মানুষজন চৈত্র মাসের শেষদিনের মধ্যে খাজনা, শুল্ক ও মাশুল পরিশোধ করতে বাধ্য থাকতেন। এরপর, নতুন বছরের প্রথম দিন ভূমির মালিকরা তাঁদের নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদের, পরিচিতদের এবং শুভানুধ্যায়ীদের মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত করতেন। পাশাপাশি ছিল হালখাতার রীতিও। হালখাতা বলতে আমরা বুঝি ব্যবসায়ীর হিসেব-নিকেশের খাতা। বৈশাখ মাসের শুরুর দিন ব্যবসায়ীরা নতুন খাতায় এক টাকার মুদ্রার সিঁদুরে ছাপ দিয়ে পুজো করে আনুষ্ঠানিকভাবে হিসাবের হালনাগাদ করতেন। আকবরের সময় থেকে চলে আসা এই নিয়ম আজও আছে। গ্রাম, শহর সকল জায়গার ছোট-বড় ব্যবসায়ী, অফিস, সর্বত্রই পুরনো হিসাবের খাতা বন্ধ করে, বছরের প্রথম দিনে লালরঙের বড় মোটা খাতাটি সঙ্গে নিয়ে, লক্ষ্মী-গণেশ মূর্তি বসিয়ে হালখাতা, বলা ভালো হালনাগাদ প্রক্রিয়াটি সারেন। এই পুজোর জন্যই ভোরবেলা থেকে দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট সহ অন্যান্য জায়গায় মানুষের লম্বা লাইন দেখা যায়।

যাঁদের কাছে পয়লা বৈশাখ (১লা) একলা বৈশাখ, তাঁদের আরও দুটি বিষয়ের কথা জানাই। এই নববর্ষের দিনই একসময় বইপাড়া মুখরিত হতো বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে। হ্যাঁ, নতুন বছরের প্রথম দিনে প্রকাশিত হতো বই। আজ আর তেমন হয় না। ‘বুকফেয়ারেই তো কত নতুন বই রিলিজ হয়। দু থেকে আড়াই মাসের মধ্যে আবার নতুন বই রিলিজ, সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া খদ্দের কই? বার যে করব, কিনবে কে? যখন বেরোত, তখনকার সময় আলাদা ছিল। সব থেকে বড় কথা মানুষের মানসিকতা আলাদা ছিল। তাছাড়া এখন সারাবছরই ছোটখাটো বই প্রকাশ অনুষ্ঠান চলতে থাকে। আলাদা করে বাংলা নববর্ষের...আসলে বাংলা নববর্ষ তার কৌলীন্য হারিয়েছে, যদিও এটি একেবারে আমার ব্যক্তিগত মতামত।’ কলেজ স্ট্রিটের এক সাধারণ দোকানের বিক্রেতার বক্তব্য এমনই। কিন্তু এক সময় এই নববর্ষেই প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের বই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সৈয়দ মুজতবা আলী, সুমথনাথ ঘোষ সহ আরও কত লেখকের বই। শোনা যায়, নববর্ষেই প্রকাশিত হয়েছিল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত চার খণ্ডে ‘পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ’। পাঁচ টাকা দিয়ে কুড়ি টাকা দামের এই বইটি সংগ্রহ করবার জন্য গ্রাহক হতে হতো। আর এই গ্রাহক হওয়ার জন্যই প্রকাশনা সংস্থার সামনে লাইন পরে যেত ভোররাত থেকে। পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট-বড় প্রকাশনা সংস্থা এই নববর্ষেই আয়োজন করতেন সাহিত্য পুরস্কারের। এখন আর এ সব কিছুই নেই, তবু এ বছর ১১ এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড-এর পক্ষ থেকে কলেজ স্কোয়ারে চলছে একটি বইমেলা।

বইয়ের সুঘ্রাণের পর এবার নতুন সুরের পালা। সুর বলতেই আমাদের মাথায় আসে গান। পুজো উপলক্ষে গ্রামাফোন কোম্পানি যেমন শারদ অর্ঘ্য বার করত, নববর্ষ উপলক্ষেও কিছু রেকর্ড বেরোত তখন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত নতুন বছরের প্রথম দিনে শুরু হতো গানমেলা, আর সেই মেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মিউজিক কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হতো নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের গানের রেকর্ড। এছাড়াও আরেক ধরনের সুর কানে আসত, যাত্রাপালা। গ্রামের বাড়ির দাশুদার কাছে শুনেছিলাম, ‘বচ্ছরের পেত্থমদিন বাধা থাকত যাত্তাপালা।’ মাঝখানে চাঁদোয়া খাটিয়ে সন্ধে থেকে সারা রাত চলত যাত্রা। সে কী অভিনয়। গলা কাঁপিয়ে একের পর এক সংলাপ বলে যাচ্ছেন অভিনেতারা। কখনও হাসছেন, কখনও কাঁদছেন। মাঠের কানায় কানায় ভরা লোক। প্রতিটা লোকের কানে পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিটি শব্দ। গ্রামের মান্নিগন্নি লোকেরা, মেয়ে-বউরা, ছোটরা, সাধারণ মানুষেরা চাঁদোয়ার তিনধারে বসে সেই আনন্দ উপভোগ করতেন। বর্তমানে সে আনন্দ অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। আগে যেমন বায়না হতো আজও কি বছরের প্রথম দিনের জন্য তেমনই বায়না হয়? ‘অনেক কমে গিয়েছে। শহরে তেমন ডাক আর নেই। গ্রামের দিকে ডাক এখনও কিছু আছে। আগে বছরের প্রথমদিনের জন্য বায়না হয়ে যেত পৌষ পার্বণের পর থেকেই। পালাকাররা নতুন বছরের জন্য নতুন পালা বাঁধতেন। মহড়া চলত তার। সে এক মহাযজ্ঞ। আজ সে রাজাও নেই, রাজত্বও নেই। যাত্রাশিল্পীদের খুবই করুণ অবস্থা। তবু তারই মধ্যে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই।’ অগ্রগামী যাত্রা কোম্পানি, আর্য অপেরা, মুক্ত মঞ্জরী, নিউ ভারতী অপেরা এমন কত যাত্রাদল, যারা আজও এই সব হারানোর দেশে বসে তাঁদের শিল্পকে ভালোবেসে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

এত মানুষ, তাদের এত আবেগ, কেমন যেন মন খারাপ লাগে। সত্যিই সব কিছুই কেমন হারিয়ে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে। পুরনোর সেই স্বাদ নতুনেরা পেল না কিছুই। নিজের শিকড়ের অস্তিত্বের জন্য লড়াই তখনই করা সম্ভব, যখন সেই শিকড় সম্বন্ধে আমরা কিছু জানব। পরিবেশ-পরিস্থিতির পট পরিবর্তনে সেই জানার সুযোগটা দিনে দিনে কমে আসছে। বিমুখ হয়ে পড়ছে নতুন প্রজন্ম। বাংলার সংস্কৃতিতে কোনও বাহ্যিক চটক নেই, আছে অন্তরের অনুভূতি। সেই অনুভূতিটুকু বেঁচে থাকুক, এই শুভ কামনাতেই বাংলার ঘরে ঘরে ফি বছর আসুক নববর্ষ।

ফোটো: লেখিকা

চলতে চলতে কলকাতা দেখা

প্রথম পাতার পর

হয় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের উদ্দেশ্যে। পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত বৃহৎ মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণ যে যত্ন সহকারে করা হয়, তা দেখলেই বোঝা যায়। মনেই হবে না এর বয়স ১০০ ছাড়িয়ে গেছে।

এলাকায় অবাঙালি মানুষেরই বাস বেশি। মজার ব্যাপার হল এই রাস্তার বিভিন্ন অংশে নানা ভাষী এবং নানা রাজ্যের থেকে আগত মানুষের বাস। এখান দিয়ে চললে মনে হয় গোটা ভারতের একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনধারা, শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার, অনুষ্ঠান অতি সহজেই চোখে পড়ে। সর্বধর্ম সমন্বয়ের সহাবস্থান দেখতে হলে আসতে হবে কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা চিৎপুরে। আমার প্রতিটি পদক্ষেপে এখানকার দৃশ্যপট পরিবর্তন হচ্ছে। যতই এগোই ততই নতুন কিছু আবিষ্কৃত হয়, এমনই এক জিনিসের কথা জানাব আগামী সপ্তাহে।

ফোটো: লেখক

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৭ এপ্রিল ২০১৭

প্রিয় বন্ধু @ কলকাতা

বন্ধ ডায়েরি ও শপিংমল

বীথি চট্টোপাধ্যায় (লেখিকা)

এই তো সেদিন কোয়েস্ট মলের দরজা খুলল কলকাতায়, ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে। সাউথ সিটি আর কোয়েস্ট মল দুটো মিলে কলকাতাকে এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শপিং স্বর্গ ধরলে খুব ভুল হবে না। বাংলাদেশের ধনী নাগরিকরা আগে সিঙ্গাপুর বা হংকং-এ বাজার করতে যেতেন। এখন তাঁরা বাজার করতে আসেন কলকাতায়। আমাদের ছাত্র জীবনে কল্পনাও করতে পারতাম না এত বিলাসবহুল বাজার আমাদের দেশে তৈরি হতে পারে। প্রথমবার সিঙ্গাপুর গিয়ে এলাহি শপিং মল দেখে ভেবেছিলাম এত বিলাসিতা আমার দেশে সহজে শুরু হবে না। আমি ভুল ভেবেছিলাম। একবিংশ শতকের দুতিন বছর কাটতে না কাটতেই কলকাতায় গড়ে উঠল একের পর এক জাঁকজমকপূর্ণ বাজার। এলগিন রোডে ফোরাম মল। ক্যামাক স্ট্রিটে ওয়েস্ট সাইড। সাউথ সিটি মল, আক্রোপলিস মল, কোয়েস্ট মল। মধ্যবিত্ত জীবনে এইসব শপিং মলগুলো কার্যত বিপ্লব নিয়ে এল। আমরা যে মধ্যবিত্ত বাঙালি এতদিন শিয়ালদা, গড়িয়াহাট বা নিউ মার্কেটের বাজারে দু-দশ টাকার জন্যে দরদাম করতাম তারা অভ্যস্ত হতে থাকলাম দরকষাকষি-বিহীন ঠান্ডা মলগুলির সঙ্গে। কোয়েস্ট মল আমার বাড়ি থেকে খুব কাছে। পৃথিবীর কত দুর্মূল্য ব্র্যান্ডের শোরুম এখানে। একদিন গুচ্চির বিখ্যাত শোরুমে একটা ছোট ভানিটি ব্যাগের দাম দেখলাম দু' লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা। একটা স্কার্ফের দাম সত্তর হাজার টাকা... কজন কেনেন এসব?

সে অবশ্য কম দামের অনেক জিনিসও এখানে পাওয়া যায়। যেসব জিনিস সংসারে কাজে লাগে।

একদিন শীতের দুপুর। কোয়েস্ট মলে এসেছিলাম সিনেমা দেখতে। হঠাৎ বিকট একটা শব্দ কানে এল। চমকে তাকিয়ে দেখি সারা বাজারে মানুষজন হঠাৎ যেন থমকে গিয়েছে। একটা গুঞ্জন ভেসে আসছে গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে। রেলিং দিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক পড়ে আছেন কৃত্রিম ফোয়ারার ওপর মুখ থুবড়ে। গায়ে কোট। ফোয়ারার জল লাল হয়ে গিয়েছে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে লোকটার মাথা থেকে। লোকটা কে?

পরদিন কাগজে পড়লাম একটি বিখ্যাত চা প্রস্তুতকারী সংস্থায় তিনি ম্যানেজার ছিলেন, সম্প্রতি চাকরি চলে গিয়েছিল ওঁর। কিন্তু রোজ অফিস টাইমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে একা বসে থাকতেন কোয়েস্ট মলের রেস্তোরাঁগুলিতে। বিয়ার খেতেন একটার পর একটা। রবিবার বাদে প্রতিদিন আসতেন শপিং মলে। সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা অবধি একা বসে কখনও কাগজ পড়তেন, কখনও মদ খেতেন, কখনও কিছু লিখতেন একটা ডায়েরিতে।

যেদিন ভদ্রলোক মলের পাঁচতলা থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েন, সেদিন-ও তাঁর ব্যাগে ছিল ডায়েরিটি। পুলিশ ওই ডায়েরি বাজেয়াপ্ত করে। সেই ডায়েরির সূত্র ধরেই পুলিশ জেনেছিল ওঁর মলে আসবার গল্প। দিনের পর দিন তিনি মলে কী কী দেখলেন সেটা লিখতেন ওই ডায়েরিতে।

খবরের কাগজে এটা পড়ে আমার প্রবল ইচ্ছে হয় ওঁর ডায়েরিটা একবার পড়তে।

উচ্চশিক্ষিত একটা লোক তিনমাস ধরে প্রতিদিন সাত-আট ঘণ্টা কাটাতেন একটা বিলাসবহুল শপিং মলে! তারপর একদিন ঝাঁপিয়ে পড়লেন মলের পাঁচতলা থেকে... মাঝের তিনমাস যা দেখেছেন লিখে গিয়েছেন। তিনি জানতেন কোথাও এসব লেখা ছাপা হবে না। শুধু লিখতে লিখতে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে গিয়েছেন লোকটা। খুব ইচ্ছে করে লোকটার ডায়েরিটা যদি পেতাম। কারণ লোকটা যে ইঁট, পাথরে তৈরি একটা বাজারের মধ্যে একটা অসমাপ্ত গল্পের রেখা টেনে চলে গেলেন। কলকাতার ইতিহাসে ওই না জানা গল্প চিরকাল থেকে যাবে। মলের ঝকঝকে দেওয়ালে রোজ ধাক্কা খাবে লোকটার লেখা কথাগুলো। লোকটার গল্প খেলা করবে এখানকার রেস্তোরাঁর ফাঁকা চেয়ারে।

(চলবে)

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, সুদীপ্ত চৌধুরী, সৌম্য নিয়োগী, রাহুল চক্রবর্তী, অতনু পাল**

বাজার @ কলকাতা

বড়বাজার

শঙ্খ রায়

'বাজার' শব্দটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। দৈনন্দিন জিনিসপত্রের প্রয়োজন মেটাতে আমাদের সকলকেই থলি হাতে বাজারে ছুটতে হয়। সেখানে গিয়ে দরদামও চলে জোরকদমে। সকালে বাজারে গেলেই বাজারে আসা ক্রেতার গলায় শুনতে পাওয়া যায়, 'কী রে সবজিগুলো টাটকা তো?' বিপরীত দিকে সবজির পসার সাজিয়ে বসে থাকা বিক্রেতার সহাস্য জবাব, 'অ্যাক্কেরে টাটকা বাবু, হাত দিয়া দেহেন।'

শুধু সবজি নয়, বাজার মানুষের দৈনন্দিন সমস্ত চাহিদাই পূরণ করে আসছে।

কলকাতার প্রাচীনকাল থেকে প্রসিদ্ধ বাজারগুলোর মধ্যে বড়বাজার উল্লেখযোগ্য। সময়টা সতেরোর দশক, বাংলাদেশে নতুন করে বাণিজ্যে জোয়ার আসছে। কলকাতাই ছিল সেই জোয়ারের প্রাণকেন্দ্র। গুজরাটি বণিকদের অবস্থা তখন ছিল দেখার মতো। ইংরেজ ও পর্তুগিজরা ব্যক্তিগত ব্যবসার দিকে ঝুঁকছে। শুধু বাঙালিরাই নয় দেশি-বিদেশি সমস্ত বণিক সে জোয়ারে গা ভাসায়। তাই মানুষের প্রয়োজনের তাগিদ ৪৮৮ বিঘা জমির উপর 'বড়বাজার' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এটি শুধু নামেই বড়বাজার নয়, এর বৈচিত্র অনেক। ইংরেজদের কাছে বড়বাজার 'গ্রেট বাজার' নামে পরিচিত। শুরুর দিকে নির্দিষ্ট কোনও জিনিসের নির্দিষ্ট কোনও স্থান ছিল না। পরে ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন আসে। নির্দিষ্ট জিনিসের নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি হয়। এভাবেই বড়বাজারে সোনাপট্টি, তুলাপট্টি নামক 'পট্টি'র জন্ম হয়। এভাবে চলতে চলতে একসময় বড়বাজারের গঠনগত অনেক পরিবর্তন আসে। 'কাটরা'র উৎপত্তি হয়। 'কাটরা' হল হিন্দুস্তানি শব্দ। এর অর্থ হল 'মান্ডি' বা 'বাজার'। একটি বিশাল বাড়ির মধ্যে অনেক ছোট ছোট ঘর। সেখানে প্রতিটি ঘরে ব্যবসায়ীরা জিনিসের পসরা নিয়ে বসে আছে।

মান্ডি তৈরির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল একটি বাড়ির মধ্যেই ক্রেতা যেন সমস্ত জিনিস পায়। সম্ভবত বড়বাজারের প্রথম কাটরার নাম 'মনোহর দাস কাটরা', ১৭৫২ সালে স্থাপিত। এখনও বড়বাজার গেলে এই কাটরার দেখা পাওয়া যায়। মনোহর দাস স্ট্রিটের পাশেই এটি অবস্থিত।

যেহেতু হুগলি নদীকে কেন্দ্র করে এই বাজার গড়ে উঠেছিল, তাই মালপত্র নিয়ে আসার এবং তা বাইরে পাঠানোর প্রধান মাধ্যম ছিল জলপথ। আগে কলকাতার দিকে হুগলি নদীর গভীরতা খুব কম ছিল তাই জাহাজ এসে লাগত পশ্চিম পাড়ে। অর্থাৎ হাওড়ার দিকে। পরবর্তীকালে পশ্চিম পাড়ের গভীরতা কমে এলে পূর্ব পাড়ের জল গভীর হয় এবং বাণিজ্যিক জাহাজ এসে পূর্ব পাড়ে নোঙর ফেলতে থাকে। ক্রমে ক্রমে রমরমা বাড়তে থাকে বড়বাজারের। বড়বাজারের ব্যবসা যত বাড়তে থাকে এলাকার জনবসতিও তত বাড়ে। সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে বহুতল বাড়ির সংখ্যাও। আর এই বাড়ি তৈরির কারণে রাস্তার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আগে এখানকার রাস্তা অন্যান্য রাস্তার মতোই কাঁচা ছিল। পরে সরকারি নির্দেশে রাস্তা পাকা করার প্রয়োজনীয় পাথর আসে বীরভূম থেকে। একটি শিশু যেমন ধীরে ধীরে বড় হয়, ঠিক তেমনভাবেই বাড়তে থাকে বড়বাজারের ব্যাপ্তি ও লোকসমাগম। লোকসমাগম যত বাড়তে থাকে দূষণ তত বাড়তে থাকে। দূষণ রোধ করার জন্য শাসকমহলের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফুটে ওঠে। তারা বড়বাজারকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

সময়টা ১৯১৯, প্রোফেসর গিডেস নামক এক ব্যক্তি শাসক দলের এই চিন্তা কিছুটা হলেও কমিয়ে দেন। তিনি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন, যেখানে নকশা এঁকে বুঝিয়ে দেন কীভাবে বড়বাজারকে সুসজ্জিত করা যায়। বড়বাজারের অন্যান্য কাজ ব্যাহত না করে কীভাবে এর উন্নতি সাধন করা যায়, তার একটি সুস্পষ্ট নকশা তৈরি করেন। কিন্তু প্রোফেসর প্যাটরিক গিডসের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

তারপর হুগলি নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, বড়বাজারের বয়সও ধীরে ধীরে বেড়েছে। আর সময়ের সাথে তাল মেলাতে এসেছে অনলাইনে জিনিস কেনার হিড়িক। মানুষ খুব সহজেই বাড়ি বসে তাদের পছন্দের জিনিস পেয়েও যাচ্ছে। তবুও বড়বাজারের মত ঐতিহ্যময় বাজারগুলো আজও স্বমহিমায়, নিজস্ব ঘারানায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদনগরীর বুকে।

পড়ার পাড়া...

কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া। দেশের বৃহত্তম এবং গোটা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর বইবাজার। গ্রন্থপ্রেমীদের মক্কা। ২০০৭ সালে বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন এই বই বাজারকে 'বেস্ট অব এশিয়া' বলে আখ্যায়িত করেছে। এই পাড়াতেই রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, হেয়ার স্কুল, হিন্দু স্কুল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মতো বহু প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অবশ্যই ঐতিহাসিক অ্যালবার্ট হল, যা কফি হাউস নামেই বহুল পরিচিত।

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে প্রকাশক, লেখক, পাঠকদের ভিড়ে বইপাড়া প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। বাজারে আসে নামকরা সাহিত্যিকদের নতুন গল্প-উপন্যাস। সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে, বাংলা গল্প-উপন্যাসের পাঠক কমছে। কারণ জানতে কলেজ স্ট্রিট বই পাড়ায় ঢুঁ দিলেন— **হেমন্ত দত্ত পুরকায়স্থ**।

'মম আই ওয়ান্ট দিস নভেল। ইউ নো, আই লাইক বুমকেশ বাক্সি (ব্যোমকেশ বক্সি)... সিন হিজ ফিল্ম ইন মাল্টিপ্লেক্স। প্লিজ মম, আমি তো লিটল বিট বেঙ্গলি পড়তে পারি...।' স্কুলে পড়া এক কিশোরের আবদার তার মায়ের কাছে। কোনও কিশোর-কিশোরী মায়ের কাছে গল্প-উপন্যাস কিনে দেওয়ার বায়না করতেই পারে। কিন্তু এ বার সেই কিশোরের মম-এর উত্তরটা শুনুন—'শেম রিক, ছিঃ! কলকাতার ফেমাস ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র হয়ে তুমি শেষ পর্যন্ত ওইসব 'ট্র্যাস বেঙ্গলি' নভেল পড়বে? বেটার ইউ বাই চেতন ভগৎ, আগাথা ক্রিস্টি অর এনি ওয়ান এলস... ফ্রম ইংলিশ লিটারেচার।'

বেলা ১১টা। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় তখন সবেমাত্র ক্রেতাদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। কলেজ রো ধরে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে একটি নামকরা প্রকাশন সংস্থার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়া এক কিশোর ও তাঁর মায়ের কথোপকথন শুনছিলেন এই প্রতিবেদক। বাংলা সাহিত্যের একমাত্র পীঠস্থান খোদ কলকাতায় বাংলা গল্প-উপন্যাসের এই হাল! কৌতূহল বেড়ে গেল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের পরিচিত বই বিক্রেতা পিন্টু দত্তের স্টলের দিকে।

পিন্টুবাবু ১৯৮১ সাল থেকে বই ব্যবসায় রয়েছেন। 'প্রান্তিক' নামের একটি পত্রিকার সম্পাদকও তিনি। তাঁর বইয়ের দোকানে বসে ভাঁড়ে চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ আগে প্রত্যক্ষ করা মা ও ছেলের কথাটা বলতেই পিন্টুবাবুর প্রতিক্রিয়া, 'নিজের চোখেই তো ব্যাপারটা দেখলেন। এই মুহূর্তে বই বাজারের হাল খুব একটা ভালো নয়।' তাঁর বুক স্টলে আনন্দ, দে'জ, মিত্র ঘোষ, গাঙচিল, মনফকিরা বা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের মতো নামীদামি প্রকাশন সংস্থার বই পাওয়া যায়। আজ একটু দেরি করেই দোকানের ঝাপ খুলেছেন পিন্টুবাবু। তাঁর কথায়, বতর্মানে বইয়ের কাটতি নেই। ধূপধুনো জ্বালিয়ে নিজের চেয়ারে বসে তিনি জানান, 'মানুষ এখন ইঁদুর দৌড়ে ব্যস্ত, বই পড়ার সময় কোথায়? তবে একেবারেই যে বাংলা বই বিক্রি হচ্ছে না, তা কিন্তু নয়। গবেষক, অধ্যাপক, বইপোকা কিছু ছাত্রছাত্রী আজও বই কিনে পড়েন। ছাত্রছাত্রীরা অবশ্য বেশিরভাগই রেফারেন্স বই কেনে।' পিন্টুবাবুর আক্ষেপ, বাংলা গল্প-উপন্যাসের বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি কোনও রাখঢাক না করেই বলেন, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ খৈনি ডলার মতো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ডলছে। কোনও বিষয়ে জানতে আগ্রহী হলে মুহূর্তেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব তথ্য পেয়ে যাচ্ছে। বই পড়ার সময় তাদের কোথায়? 'তবে এখনও কিছু বইপোকা পাঠক আমাদের এখানে আসেন। বিশেষ করে বাংলা নববর্ষে যে নতুন বই প্রকাশিত হয়, তার মধ্য থেকে সেরা বইগুলিকে বেছে কিনে নিয়ে যান। তবে অ্যাকাডেমিক বা রেফারেন্স বইয়ের বাজার খুব একটা খারাপ নয়। এ সব বিক্রি করেই বইপাড়া টিকে আছে। শুধু বাংলা নয়, ইংরেজি বইয়ের পাঠক সংখ্যাও কমছে।' এর কারণ ব্যাখ্যা করে পিন্টুবাবু বলেন, '১১০ টাকা মূল্যের কোনও একটি ইংরেজি গল্প-উপন্যাস পাঠক ইন্টারনেটের মাধ্যমে মাত্র ৮৬ বা ৮৭ টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। তা হলে কেন পাঠক বইপাড়ায় আসবেন?' তাঁর কথায়, কয়েক বছর আগেও বাংলা গল্প-উপন্যাস বা গবেষণামূলক গ্রন্থের চাহিদা বেশ ভালো ছিল।

একটা সময় ছিল যখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসুর নতুন গল্প-উপন্যাসের বিজ্ঞাপন পত্রিকায় বের হলেই বইপাড়ায় পাঠকের লাইন পড়ে যেত। এখন এই প্রজন্মের অনেক লেখক, সাহিত্যিক ভালো লিখছেন, সাহিত্য পুরস্কারও পাচ্ছেন। কিন্তু প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর আর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে না। এর কারণ কি পাঠকদের বই পড়ায় অনীহা, নাকি সে ধরনের ভালো লেখা হচ্ছে না? এই প্রতিবেদকের প্রশ্নে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পিন্টুবাবু জানান, 'সত্যিই সে রকম ভালো লেখা আজ আর কেউ লিখছেন না। ১৯৮১ সাল থেকে আমি বই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, নিজেও একজন বইপোকা বলতে পারেন। বইকে ভালো না বাসলে এতদিনে অন্য ব্যবসায় চলে যেতাম। জানেন, ২০১৬ এবং '১৭-র কলকাতা বইমেলায় সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হর্ষ দত্ত, নিমাই ভট্টাচার্যের মতো লেখকের নতুন কোনও সংস্করণ বাজারে আসেনি। সুচিত্রা ও সুনীল তো ইতিমধ্যেই গত হয়েছেন। সঞ্জীববাবু, মানে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ও আধ্যাত্মিক বই লেখায় ব্যস্ত, একমাত্র শংকরই বাজারটা ধরে রেখেছেন। তবে ওই বিবেকানন্দ-টন্দ দিয়ে। কই আর একটা 'জনঅরণ্য', 'মানসম্মান' বা 'চৌরঙ্গী' তো লেখা হয়নি? তাই প্রকাশকরা বাধ্য হয়ে অমুক বিখ্যাত লেখকের পাঁচটি উপন্যাস, ত্রিশটি গল্প-সংগ্রহ নাম দিয়ে পুরনো বইগুলিই নতুন করে ছেপে বাজারে ছাড়ছেন।'

রবীন্দ্রনাথ 'কপিরাইট'মুক্ত হওয়ার পর রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা কি বেড়েছে? এই প্রতিবেদকের প্রশ্নের উত্তরে পিন্টুবাবুর প্রতিক্রিয়া, 'দেখুন, রবীন্দ্রনাথের বইয়ের পাঠক আলাদা। তিনি কালজয়ী। যতদিন লোকে বই পড়বে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের বইও বিক্রি হবে।' আমার প্রশ্নটা ছিল— কপিরাইট মুক্ত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের পাঠক সংখ্যা কি বেড়েছে? 'তা একটু তো বেড়েছেই। সস্তার রবীন্দ্ররচনাবলি এখন গ্রাম বা মফস্‌সলের পাঠকরা কিনছেন। সবাই এখন ফিফটি পার্সেন্টের পেছনে দৌড়চ্ছেন। মলাট থেকে বাঁধাই সবই নিম্নমানের। মডেলদের ছবি দিয়ে মোটা দাগের প্রচ্ছদ তৈরি হচ্ছে।' পিন্টুবাবুর মতে, 'বিশ্বভারতীর ছাপা বইগুলিই কলকাতায় এখনও লোকে খোঁজে। বিশ্বভারতীর বইয়ে আগে কি কোনও ছবি বা স্কেচ থাকত? অথচ কী রুচিসম্পন্ন প্রচ্ছদ ছিল...।'

তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরও বইয়ের প্রতি আগ্রহ কমছে। বাংলা বই আজ আর পড়তে চায় না ওরা। এর কারণ ব্যাখ্যা করে পিন্টুবাবু জানান, 'আজকালকার বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ছে। জন্মের পর থেকেই মা-বাবার পরিবর্তে ওরা ড্যাড, মম বলতে অভ্যস্ত। তাই মাতৃভাষার প্রতি তাদের কেনই বা নাড়ির টান থাকবে? আপনার আশেপাশে একটু নজর দিলেই বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাইছি। আমাদের মা-ঠাকুমারা তো কোনওদিন স্কুলের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেননি আমাদের। আর এখন? বাচ্চাদের হাতে স্লেটের মতো ইলেকট্রনিক গ্যাজেট বা ট্যাবলেট ধরিয়ে দিয়ে এসি গাড়ি করে স্কুলের দরজায় পৌঁছে দিচ্ছেন এদের বাবা-মা। তাই দামি গাড়ির রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে ওরা জগৎটাকে দেখছে। ঠাকুমা-দিদিমার কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প ওরা শোনেনি। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির গল্প, লালপরি-নীলপরির কল্পনার জগৎ থেকে, সাহিত্যের জগত থেকে, দর্শনের জগৎ থেকে শিশুরা আজ বহু যোজন দূরে—পাঁচ হাজার বা দশ হাজার বর্গ ফুট ফ্ল্যাটের এক ভিন গ্রহের বাসিন্দা...। তাই সাহিত্যের প্রতি তরুণ প্রজন্মের কেনই-বা আগ্রহ থাকবে?'

পিন্টুবাবুর কথাই প্রতিধ্বনিত হয় বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পাঠক বনবিহারী মান্নার কণ্ঠেও। মান্নাবাবু 'টাটা স্টিল স্পোর্টস'-এর সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে ৪২ বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছেন। শুধুমাত্র বইকে ভালোবেসে। মান্নাবাবু জানান, সম্প্রতি একটি কলেজপড়ুয়া ছেলে তাঁর দোকান থেকে কয়েক হাজার টাকার বই কিনে নিয়ে যায়। এই মন্দার বাজারে চার-পাঁচ হাজার টাকার বই কিনছে এক কলেজ পড়ুয়া। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে মান্নাবাবু সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বইগুলি সে কার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছে? উত্তরে ক্রেতা ছেলেটি জানায়, বইগুলো তাঁর বৃদ্ধ বাবার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছে। না হলে সে কেন মরতে বই পাড়ায় আসবে? এই হচ্ছে বই নিয়ে তরুণ প্রজন্মের মনোভাব। 'অথচ এই অঞ্চলেই রয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজ, সিটি কলেজ, হিন্দু স্কুল, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, হেয়ার স্কুল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান। সিলেবাসের বই ছাড়া সাহিত্যে কারও আগ্রহ নেই। আমাদের টাটা স্টিল স্পোর্টসের লাইব্রেরিতে বাংলা বইয়ের কালেকশন ছিল প্রায় ১৮ হাজার। ৪০বি চৌরঙ্গি রোডে রয়েছে সেই গ্রন্থাগার। ইংরেজি বই রয়েছে প্রায় আট হাজার। কিন্তু ২০১০-১১ সাল থেকে এই বিশাল লাইব্রেরির পাঠক, বিশেষ করে তরুণ পাঠকদের সংখ্যা দারুণভাবে কমেছে।' বইমেলা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মান্নাবাবু বলেন, সেখানকার অবস্থা আরও খারাপ। সারাদিনের জন্য আড্ডা, খাওয়া দাওয়া আর প্রেম করতেই ছেলেমেয়েরা বইমেলায় যায়। ক'জন ক'টা বই কেনে? তবে তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়ে যাঁরা এখনও বাংলা বই পড়ে, তাঁরা আদিরসাত্মক বা বড় বাড়ির বড় বংশের অবৈধ প্রেমের কেচ্ছা-কাহিনিই পড়ে। আর মহিলা পাঠক প্রায় নেই বললেই চলে। সবাই আজকাল বস্তাপচা শাশুড়ি-বউমা সিরিজের টিভি সিরিয়াল, শপিং মল আর স্কুল-কলেজে পড়া ছেলেমেয়েকে নিয়েই তো সর্বক্ষণ ব্যস্ত। বই পড়ার সময় কোথায়?'

এক সময় তা রহস্য-রোমাঞ্চ বা গোয়েন্দা সাহিত্যের ভালো পাঠক ছিল, ভালো বাজার ছিল। নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'মৃত্যুবাণ', 'কালো ভ্রমর', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যোমকেশ', সত্যজিৎ রায়ের 'ফেলুদা' সবাই পড়ত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো সাহিত্যিকও বিশাল সংখ্যক পাঠকের চাহিদার কথা ভেবে গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন—

'ঠিকই বলেছেন, গোয়েন্দা গল্পের বই এখনও বাজারে কাটে। তবে ফেলুদার পর তেমন গোয়েন্দা বাজারে আসেনি। নীহার রঞ্জনের কিরীটী রায়, ব্যোমকেশ বক্সি তো বহু আগের। তবে, সবচাইতে বেশি চাহিদা এখন আঁকার বইয়ের। এ ছাড়া, 'ছাত্রবন্ধু' গোত্রের মেড-ইজি এখনও বাজারে কাটে। আর সিলেবাসের বই তো প্রায় উঠেই গেছে। কারণ এ সব বই এখন সরকার বিনিপয়সায় বিতরণ করছে। কয়েকটি হাতেগোনা প্রকাশনা সংস্থা বই ছাপার বরাত পায়।'

তবে বইপাড়ার প্রকাশনা সংস্থা থেকে বিক্রেতা সবাই একবাক্যে জানান, যতই খারাপ অবস্থা আসুক বইপাড়ার মৃত্যু হবে না কোনও দিন।

ছবি: প্রতিবেদক

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৭ এপ্রিল ২০১৭

জল-ব্যবস্থা

কৃষ্ণগোপাল রায়

নগর পত্তনের আগে কলকাতা অঞ্চলে যারা বসবাস করত তাদের স্নানাহার এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জল-ব্যবস্থা কীরকম ছিল তার কাগুজে প্রমাণ পাচ্ছি না। কিন্তু নগর পত্তনের একেবারে প্রথম পাদেই ইংরেজরা জীবনযাপনের পক্ষে প্রথম প্রয়োজনীয় এই বস্তুটির একটি পাকাপাকি সু-ব্যবস্থা করে নিতে চেয়েছে। কলকাতায় আগে যারা বসবাস করত তন্তুবায়, শেঠ, বসাক বা তাদের সহযোগীরা, তারা প্রায় সকলেই বসবাস করত গঙ্গা বা আদি গঙ্গার অববাহিকায়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে ভাগীরথী গঙ্গাই ছিল তাদের জলের উৎস। ইংরেজরা প্রাথমিকভাবে এই উৎসকেই কাজে লাগাতে বাধ্য হলেও, এ জল তদের পছন্দ ছিল না। কারণ তারা স্পষ্টতই দেখছিল নদী দিয়ে জীব-জন্তু এমনকী মানুষেরও পচা-গলা শরীর ভেসে যাচ্ছে। জনপদের নোংরা জল গিয়ে মিশছে নদীতে, মানুষ স্নান ও শৌচকর্মও করছে ওই নদীর জলে, গবাদি পশুর স্নানও করাচ্ছে। দেশীয় মানুষ এই জল পান করতে বা এই জলে রান্না করতে তবু যে দ্বিধা করত না, তার কারণ কেবলমাত্র এ নয় যে তারা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল। অনভিজ্ঞতা তো ছিলই, তার চেয়ে বড় কথা তাদের বিশ্বাস ছিল গঙ্গা পবিত্র, তা কখনও দূষিত হতে পারে না। ইংরেজরা তাদের সাধারণ যুক্তিবোধেই এসব বিশ্বাসে আচ্ছন্ন না হয়ে পানীয় জলের পৃথক ব্যবস্থার কথা ভাবল। ১৭০৭ সালে তারা খনন করাল লালদিঘি। সম্পূর্ণরূপে পানীয় জলের জন্য। লালদিঘির জল সাহেবরা ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করতে পারত না। ভিস্তিরা এই জল বাঁকে বয়ে সাহেবদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসত।

ইংরেজদের এই স্বাস্থ্যসচেতনতা অল্পদিনের মধ্যেই দেশীয়দের একটা অংশকে প্রভাবিত করল। তাদের মধ্যে যারা ধনী, তারা কেউ কেউ নিজ গৃহে পুকুর খনন করাল, আর অনেকে বিশেষ বিশেষ পুণ্যতিথিতে লোক লাগিয়ে নদী থেকে জল আনিয়ে বড় বড় জালায় তা সম্বসরের জন্য সংগ্রহ করল। পুজো-আর্চায় গঙ্গার ছাড়া অন্য জল ব্যবহার করার মানসিকতা ছিল না তাদের। তবে পানাহারের জন্য তাকে শোধন করে নেবারও ব্যবস্থা করল তারা। প্রথমত, দীর্ঘদিন স্থিতাবস্থায় থেকে জলের ঘোলাটে ভাব কেটে যেত, কাদা বিশ্লিষ্ট হয়ে চলে যেত নীচে, তদুপরি উত্তপ্ত লোহাকে জলের মধ্যে রেখে তার জীবাণুনাশের ব্যবস্থা করা হতো। তারপর বালি আর কাঠকয়লার মাধ্যমে তাকে পরিস্রুত করে নেওয়া হতো। বলা বাহুল্য এই ব্যয়সাধ্য বিপুল আয়োজন সকলে করতে পারত না । এদেশীয় সাধারণ মানুষের জন্য ইংরেজরাই বর্তমান কলকাতা ময়দান অঞ্চলে পুকুর কাটিয়ে দিয়েছিল। লালদিঘি বা এই পুকুর থেকে জল সংগ্রহ করে সমস্ত ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানো যে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য, তা কিন্তু সেকালের সাহেব-জমিদাররা ভুলে যায়নি। বিশেষত কলকাতা তখন বাড়ছে— আয়তনে বাড়ছে, লোকসংখ্যায় বাড়ছে; সেই অনুপাতে বেড়ে যাচ্ছে জলের প্রয়োজন। এই ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের দাবিতে ইংরেজরা অষ্টাদশ শতকের আশি-নব্বইয়ের দশক থেকে শহরের নানা স্থানে পুকুর কাটিয়ে লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরিয়ে রাখার উদ্যোগ নেয়। এই সমস্ত পুকুরগুলিতে স্নান করা, কাপড় কাচা, গরু-মোষ স্নান করানো নিষিদ্ধ ছিল, কেবল পানাহারের জন্যই সংরক্ষণ করা হতো পুকুরগুলি।

১৮২০ সালে চাঁদপাল ঘাটে নদী থেকে জল সংগ্রহের বাষ্পীয় যন্ত্র বসানো হয়। এই জল শহরের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য তৈরি করা হয় বড় বড় পাকা নালা। ডালহৌসি স্কোয়ার, ধর্মতলা, চৌরঙ্গি আর চিৎপুর অঞ্চলে ছিল এই নালাগুলি। উপরে ঢাকা ছিল না, সুতরাং ধুলোবালি বা নোংরা পড়ার অবকাশ ছিলই। কিন্তু শহরের গরিব-গুর্বো এই জলই কলসিতে করে সংগ্রহ করত এবং এতেই চলত তাদের পানাহারের কাজ। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, ধনী বা সাহেবদের বাড়িতেও বড় বড় জালায় ভরে গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো; এই জল তারা ব্যবহার করত স্নানাহার ছাড়া অন্য সমস্ত কাজে।

১৮৬৪-১৮৭০-এ পলতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস’, যেখানে গঙ্গা থেকে আনা জল পরিশোধন করে পাইপের মাধ্যমে নাগরিকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা

করা হয়। বলা বাহুল্য, পৌরজনসেবার ক্ষেত্রে এ একটি অত্যন্ত বড় পদক্ষেপ।

কিন্তু যে কোনও যুগান্তকারী কাজেরই পক্ষে-বিপক্ষে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে। পাইপের মাধ্যমে পরিশ্রুত সরবরাহের ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল। রক্ষণশীল হিন্দুরা অনেকেই পাইপের ভিতর দিয়ে আসা জলকে সেদিন পানাহার বা পূজার কাছে ব্যবহার করতে রাজি হননি। কিন্তু তাদের উচ্চকণ্ঠ আপত্তি বেশিদিন ধোপে টেকেনি; প্রয়োজন এবং বিকল্প ব্যবস্থার অনটন হেতু পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তারা বাধ্য হয়। তবে সমাজের প্রগতিশীল অংশের মানুষ সানন্দে স্বাগত জানায় নতুন জল ব্যবস্থাকে। রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’-তে তাঁর দশ-এগারো বছরের স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন: তখন সবেমাত্র শহরে জলের কল হইয়াছে। তখন নূতন মহিমার ঔদার্যে বাঙালীপাড়াতেও তাহার কার্পন্য শুরু হয় নাই। শহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার দাক্ষিণ্য সমান ছিল। সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতলাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম।

১৮৭০-এ কলকাতায় এসেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, তিনি লিখেছেন, ‘নতুন ওয়াটার ওয়ার্কস সবে তৈরি হয়েছে। আর এই শহরের মানুষ পরিশ্রুত পানীয় জলের অফুরান সরবরাহ পাচ্ছেন, যদিও গোঁড়া হিন্দুরা অশুদ্ধ ভেবে এই জল ব্যবহারে দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু এই কলের জল তাহার আপন মহিমাতেই ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। অবশেষে সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল পাইপের জল। অল্পদিন পরেই পরেই পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহ শুরু হওয়ায় চিৎপুর, ধর্মতলা, চৌরঙ্গী ও ডালহৌসি স্কোয়ারের সেই বড় বড় নালাগুলো বুজিয়ে ফেলা হল, রাস্তাগুলোকে করা হল প্রশস্ত। এই সময় পলতা থেকে প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন ৬ মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহ করা হত।’

শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রয়োজন বেড়ে যায়। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, পার্ক-বাগিচা, নির্মাণকাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হয় জলের। এই প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা জলের প্রয়োজন কেবল সারফেস ওয়াটার’ বা নদীজল থেকেই মেটেনি। নদীজল বা পলতা সরবরাহ ছাড়াও প্রথম থেকেই ‘গ্রাউন্ড ওয়াটার’ অর্থাৎ মাটির নীচের জল সংগ্রহ করা দরকার হয়েছে। প্রথমে কুয়ো বা ইঁদারার মাধ্যমে পরে পাম্পের সাহায্যে মাটির নিচ থেকে জল সংগ্রহের কাজ চলেছে। অর্থাৎ কলকাতার ‘সারফেস ওয়াটার’, ‘গ্রাউন্ড ওয়াটার’ উভয় উৎসের জলই ব্যবহার হয়েছে প্রথম থেকে।

‘গ্রাউন্ড ওয়াটার’ অধিক পরিমাণে ব্যবহারে কিন্তু বিজ্ঞানীদের সতর্কবাণী আছে। এতে মৃত্তিকার ঘনত্ব কমে গিয়ে ভূমিকম্প হতে পারে বা ধ্বস নামতে পারে। সেক্ষেত্রে সর্বনাশ হবে কলকাতার। সরকার বাধ্য হয়েছে পলতায় ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি করে তার পরিস্রুতিকরণ ক্ষমতা বাড়ানোর। ২০০৬-এ এই কাজ করতে গিয়েই ‘পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস’-এর নাম পাল্টে রাখা হয়েছে ‘ইন্দিরা গান্ধী ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট’, ‘জয় হিন্দ জল প্রকল্প- ধাপা’ এবং ‘গার্ডেন রিচ ওয়াটার ওয়ার্কস’। এর পরেও দরকার হয়েছে ‘বেহালা বুস্টার পাম্পিং স্টেশন’-এর, যা সংলগ্ন এলাকায় জলব্যবস্থা তৈরি করেছে, নির্মাণ কার্যেও যথেচ্ছ ব্যবহার করছে ওই জল; চুরিও হচ্ছে জলের। সরকার তার পরিকল্পনায় অবশ্য ৩৫% অপচয় ধরেই পরিকল্পনা করে; কিন্তু নাগরিক সচেতনতা ও সাবধানতা যদি বাড়ানো যায় তবেই অপচয়ের মাত্রা কমবে। কর লাগছে বা লাগছে না সেটা আদৌ বড় কথা নয়; কারণ জলের নামে না নিলেও অন্য নামে করের অর্থ সরকারকে নিতেই হবে। বড় কথা হল অপচয় রক্ষা।

কলকাতাবাসী যদি এ বিষয়ে সচেতন হয় তবে রাস্তার ধারে অসংখ্য ট্যাপে অনর্গল জল ঝরে পড়বে না, পাবলিক ইউরিনালগুলিতে অযথা সবসময় জল গড়াবে না, ঘরে ঘরে সারফেস ওয়াটার ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হবে, গ্রাউন্ড ওয়াটারকে রাখা হবে কেবল বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে। শাস্তির ভয় থাকলে তবে মানব, সামনে দাঁড়িয়ে নির্দেষ দিলে তবেই শুনব, তা নয়; কলকাতা আমাদের, তা জলস্নিগ্ধ থাক, নিরাপত্তাময় হোক কলকাতার জীবন-যাপন, সে দায় নিতে হবে আমাদেরও।

লেখক চাপরা বাঙালঝি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য জানতে

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড (২৩৫৯১৯১৫, ২৩৩৭১১৫০)

সিইএসসি গ্রাহক পরিষেবা (২৪৭৮৪৩০২, ২৪৭৮৪৮৮৮, ২৪৭৮৪৮৮৯)

অভিযোগ:

সিইএসসি (উত্তর) ২২৩৭৩১৬১, ২২৩৭৬৪

সিইএসসি (দক্ষিণ) ২৪৬৬৪৬৪৩, ২৪৬৬৩১৬১, ২৪৬৬৩১৬২

বেহালা ডিপো (এমার্জেন্সি) ২৪৭৮১৬৭৩

কালীঘাট ডিপো (এমার্জেন্সি) ২৪৫৫৫৬০৯

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৭ এপ্রিল ২০১৭

কবিগুরুর বীণাপাণি

মনীষা ভট্টাচার্য

পর্ব-চার

সারেগা, রেগামা, গামাপা, পাধানি, ধানিসা...হারমোনিয়ামে গলা সাধছে পাশের বাড়ির বুচকি। সরগমের পর সাধারণত রবীন্দ্রসংগীতই ধরে আপামর বাঙালি। বুচকিও তাই ধরল, 'আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন'। এমা-আ-আ, হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত? অবাক লাগছে প্রশ্নটা শুনে? ভাবছেন, তাই তো দেখে এসেছেন। কিন্তু জানেন কি, গুরুদেবের ভীষণ অপছন্দ ছিল তাঁর গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজানো? আজ ফিরে যাই সেই গল্পে।

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন কেন্দ্র অধিকর্তা স্টেপলটন অনেকদিনের ছুটি নেওয়ায় সেই জায়গায় অস্থায়ী স্টেশন ডিরেক্টর হিসাবে আসেন অশোককুমার সেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর নিজেই ব্যবস্থা করে যান কবির সঙ্গে দেখা করতে। ড. ধীরেন্দ্রমোহন সেন সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন থাকেন উত্তরায়ণে। চায়ের আসরে অশোকবাবু কবিকে সরাসরিই জিজ্ঞেস করলেন বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার সম্পর্কে কবি উদাসীন কেন? এই প্রশ্ন শুনে কবির সপ্রতিভ উত্তর ছিল, অল ইন্ডিয়া রেডিও-র স্টুডিওতে হারমোনিয়ামের দৌরাত্ম্য চলতে থাকলে তার আঘাতে তিনি রবীন্দ্রসংগীতকে হত্যা করতে দিতে মোটেই রাজি নন। কবির ক্ষোভের কথা শুনে অশোকবাবু বিনীতভাবে তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, গুরুদেবের আপত্তি তিনি জানাবেন ফিলডেনের কাছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। এক বছরের মধ্যেই অল ইন্ডিয়া রেডিওর সমস্ত কেন্দ্র থেকে হারমোনিয়াম বর্জনের নির্দেশ আসে ফিলডেনের পক্ষ থেকে। এই খবর পেয়ে কবি, অশোককুমার সেনকে জানালেন, 'ডিয়ার অশোক, আই হ্যাভ অলওয়েস বিন ভেরি মাচ এগেইনস্ট দ্য প্রিভেলেন্ট ইউজ অব দ্য হারমোনিয়াম ফর পারপাস অব অ্যাকোম্প্যানিয়েন্ট ইন আওয়ার মিউজিক অ্যান্ড ইট ইজ ব্যানিশড কমপ্লিটলি আওয়ার আশ্রম। ইউ উইল বি ডুয়িং আ গ্রেট সার্ভিস টু দ্য কজ অব ইন্ডিয়ান মিউজিক ইফ ইউ ক্যান গেট ইট অ্যাবান্ডান্ড ফ্রম দ্য স্টুডিওজ অব দ্য অল ইন্ডিয়া রেডিও।' এ চিঠির তারিখটি হল ১৯ জানুয়ারি, ১৯৪০।

১৯৩৯ সালে, কবির সঙ্গে যখন রেডিওর সম্পর্ক ধীরে ধীরে ভালো হচ্ছে, তখন একবার রেডিও কর্তৃপক্ষদের কবি অনুরোধ করেন শান্তিনিকেতনে কলকাতা বেতারের একটি সহায়ক স্টুডিও চালু হোক। কবির এই অনুরোধকে সাগ্রহে অনুমতি দিয়েছিলেন ফিল্ডেন সাহেব, কিন্তু ডাক ও তার বিভাগের চরম ঔদাসীন্যে সে প্রস্তাব কার্যকর হয় না। পরবর্তীতে স্বাধীনতার কয়েক মাস আগে কবির ইচ্ছার সেই বেতার স্টুডিও চালু করা হয়। গুরুদেবের জীবদ্দশাতেই কলকাতা কেন্দ্রে সম্প্রচারিত হয় 'শেষের কবিতা'। গুরুদেব সেই নাটক শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। অভিনয়ে ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনা দেবী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ওই বছরই মে মাসে কবির জন্মদিনে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কবির বাণী প্রচারিত হবে। কবি সেই সময় পুরীতে। বেতার কর্তৃপক্ষ যান সেখানে। সঙ্গে ছিল কবির ভাষায় 'ক্ষুদে শয়তান' রেকর্ডিং মেশিন। শুরু হল রেকর্ডিং, কিন্তু নিজের আবৃত্তি শুনে কবির নিজেরই তা পছন্দ হয় না কারণ তাঁর কণ্ঠ প্রায় ঢেকে দিয়েছিল সমুদ্রের গর্জন। অশোককুমার সেন তাঁর স্মৃতিকথায় এক জায়গায় লিখছেন, 'রবীন্দ্রনাথ এবার বেঁকে বসলেন।...কবির এই মনোভাব দেখে আমরা ভাবছিলাম এবার কি করা যায়। প্রভাত মুখোপাধ্যায় বললেন, কবি যে অসম্মত হয়েছেন এ কথাটাই রেকর্ড করে নিয়ে যাওয়া হোক। তখন আমি নিজেই কবিকে অনুরোধ করলাম। কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে কবিকে শোনানো হল। শুনে তিনি খানিকটা খুশি হলেন। ...শেষ পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিতে মিলিয়ে মোট আটটি কবিতা রেকর্ড করলেন কবি। এই রেকর্ডের একটি সেট কবিকে পরে উপহার দেওয়া হয়েছিল শান্তিনিকেতনে।'

সেই আটটি কবিতার মধ্যে একটি ছিল 'প্রশ্ন'। সারা ভারতে তখন একদিকে মহাত্মা গান্ধীর প্রকাশ্য অহিংস আন্দোলন আর অন্যদিকে বাংলার বিপ্লবীদের সশস্ত্র বিপ্লব। চলছে ব্রিটিশের অমানুষিক অত্যাচার। এরই পরিপেক্ষিতে কবি লিখেছিলেন 'প্রশ্ন' কবিতা। প্রথমে সেই কবিতা সম্প্রচার নিয়ে কলকাতা বেতার দ্বিধান্বিত থাকলেও, নির্দিষ্ট দিনে, বিনা বাধায় এবং বিনা দ্বিধায় কবিকণ্ঠে বেজেছিল সে কবিতা, শহরবাসী তা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এই ১৯৩৯ সাল কলকাতা বেতারের পক্ষে একটি

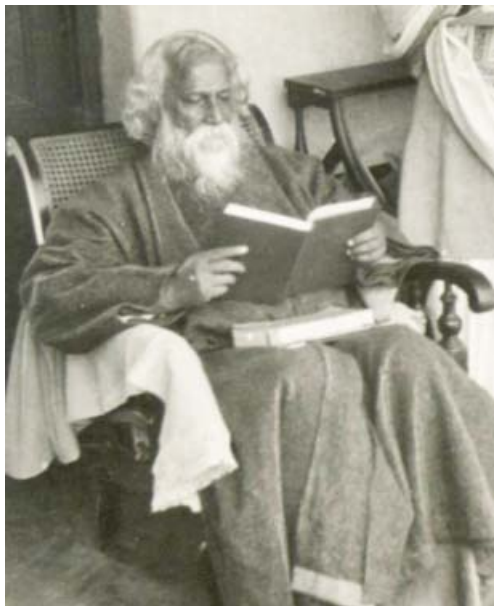

উল্লেখযোগ্য বছর কারণ কবি প্রথম পা রেখেছিলেন কলকাতার ১নং গার্স্টিন প্লেসের বেতার কেন্দ্রে। বেতার কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বারে প্রায় কুড়ি ফুট বাই আট ফুট লম্বা বৃত্তের মধ্যে সবুজ সিমেন্টের একটি ভারতে রেখাচিত্র ছিল। কবি যখন প্রবেশ করলেন বেতার কেন্দ্রে তখন তিনি সেই ভারতের রেখাচিত্রটি দেখেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিলেন অশোককুমার সেন এবং ডাইরেক্ট জেনারেল বোখারী সাহেব। দুজনেই অনায়াসে সেই রেখাচিত্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন। কবি বৃত্তের সামনে দাঁড়িয়ে আনত মস্তকে ভারত জননীর সিমেন্ট রচিত রেখাচিত্রটিকে প্রণাম জানিয়ে, অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে পথপদর্শকদের অনুসরণ করেছিলেন। আসলে কবির কাছে মাটি যে মা। তাই তার উপর পা দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারেননি।

কানাডা ব্রডকাস্টিং কোম্পানি বিশ্বভারতীকে অর্থ সাহায্য করেছিল, তার মূলেও ছিল এই বেতার। কবি যখন মংপুতে, তখন সেখানেও পৌঁছেছে কলকাতা বেতার। বাকি থাকল এমনই আরও অনেক কথা। আসলে বেতারের সঙ্গে গুরুদেবের সম্পর্ক এতটাই গভীরতা পেয়েছিল যে দুই পর্বে তাকে ধরা সম্ভব হল না। আগামী বেতার কথায় আরও কিছু তথ্য নিয়ে সাজাব 'কবিগুরুর বীণাপাণি'-র শেষপর্ব।

দেবকী বসু

শৈবাল পত্রনবীশ

পর্ব: আট

বর্ধমানের এক প্রতিষ্ঠিত উকিল বাড়ির একটি ছেলে স্কুলে পড়তে পড়তেই মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরীক্ষার হল থেকে বেড়িয়ে গেলেন। এরপর থেকে তিনি একা একাই থাকতে শুরু করলেন অন্যত্র। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিঃসঙ্গ থাকার ব্যবস্থা হলেও আহারাদির জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন অনুভব করে তিনি বর্ধমানের একটি বাজারে গামছা ও তোয়ালের দোকান খুলে বসলেন, সঙ্গে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন। দুটো জায়গা থেকে যা রোজগার হতো, তাতে তাঁর ভরণপোষণ চলে যেত। পত্রিকাটির নাম হয়তো অনেকেই জানেন না, ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম প্রবাদপ্রতিম চিত্রনির্মাতা দেবকী বসু দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম 'শক্তি'। এভাবে কিছুদিন চলার পরে হঠাৎই একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন সেই যুগের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডিজি অর্থাৎ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বর্ধমানে গিয়ে তিনি ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, 'আমি খবর পেয়েছি যে তুমি খুব ভালো লেখো। তুমি সময় করে এর মধ্যে কলকাতায় আমার বাড়িতে এসো।' ঠিকানা দিয়ে গেলেন, দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে যুদ্ধরত ছেলেটিও একদিন কলকাতায় তাঁর বাড়িতে গেলেন। তাঁকে দেখে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডিজি বললেন, 'এখন থেকে আমার সব ছবির চিত্রনাট্য তুমিই লিখবে।' একথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন দেবকী বসু। ভাবলেন, চিত্রনাট্য লেখা, তাও আমি? এই কাজ করতে করতেই পরবর্তীকালে দেবকীকুমার যুক্ত হলেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর সঙ্গে। নবীন চিত্রনাট্যকার ধীরে ধীরে ছবিতে সংগীতের ব্যবহার সম্পর্কে নানান নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। স্টুডিওর কর্ণধার বি এন সরকার সবটাই লক্ষ রাখতেন। নিউ থিয়েটার্স স্বীকার করল এই ছেলেটির ভিতর অসাধারণ প্রতিভা লুকিয়ে আছে। এরপরে তিনি চিত্রপরিচালক হওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন। সরকার সাহেব দেবকী বসু অসাধারণ ক্ষমতার বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং এক কথায় তাঁকে ছবি পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। দেবকী বসুর জনপ্রিয়তা সবটাই নিউ থিয়েটার্সের সৌজন্যে। কী করে সেখানে তিনি যুক্ত হলেন সেই গল্পটা বলা যাক। স্টুডিওতে 'পুনর্জন্ম' ছবির কাজ চলছে। সেই সময় একদিন দেবকীবাবু সরকার সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। সরকার সাহেব বললেন,

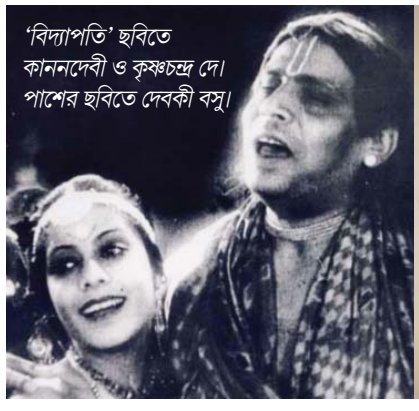

'বিদ্যাপতি' ছবিতে কাননদেবী ও কৃষ্ণচন্দ্র দে। পাশের ছবিতে দেবকী বসু।

'আপনি তো গল্প শোনাতে এসেছেন, তাহলে নীতিন বসুর সঙ্গে দেখা করুন।'

অনেক চেষ্টা করে নীতিনবাবুর সাক্ষাৎ পেলেন। নীতিন বসুর ভাষায়, 'নাটকীয় ভঙ্গিতে দেবকীবাবু চণ্ডীদাসের গল্প শোনাতে শুরু করলেন। সংলাপ শুনতে শুনতে আমার চোখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। তাঁর হাতদু'টো জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম অসাধারণ গল্প শোনালেন।' কথাটা গেল সরকার সাহেবের কানে। চিত্রপরিচালক হিসাবে দেবকী বসুর জায়গা পাকা হয়ে গেল নিউ থিয়েটার্সে। শুধু বাংলা ছবি নয়, সঙ্গে মরাঠি এবং হিন্দি ছবি। দেবকীবাবুর 'চণ্ডীদাস' ছবিতে প্রথম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের প্রথা চালু হল। ভারতীয় চলচ্চিত্রে সম্ভবত প্রথমবার নেপথ্য সংগীতের প্রয়োগ হল। ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে পরের ছবি 'সীতা' চলচ্চিত্রের ভাষায় সুপার-ডুপার হিট করল। অভিনয় করেছিলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর ও দুর্গা খোটে। 'সীতা' প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যা বিদেশের মাটিতে পুরস্কৃত হয় ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভেলে। অনেক পরে পাঁচের দশকে তাঁর 'সাগর সংগমে' ছবিটিও বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মনোনীত হয়েছিল। ওই ছবিটিই ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

দেবকী বসু পরিচালিত সফল ছবির সংখ্যা অগণিত। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল 'মীরাবাঈ', 'নর্তকী', 'বিদ্যাপতি', 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য', 'চিরকুমার সভা', 'নবজন্ম' ইত্যাদি। 'সাপুড়ে' ও 'সাগর সংগমে' ছবি দুটি ইংরেজিতে করেছিলেন। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে একটি ছবি তৈরির অনুরোধ করা হয়। কবির চারটি কবিতা নিয়ে তৈরি করলেন 'অর্ঘ্য'। কবিতাগুলি ছিল 'পূজারিণী', 'পুরাতন ভৃত্য', 'অভিসার' ও 'দুইবিঘা জমি'। ভারতীয় চলচ্চিত্রে সম্ভবত প্রথমবার কোনও কাব্যের চলচ্চিত্রায়ন হল। চলচ্চিত্র পরিচালনা ছাড়াও তিনি বিখ্যাত লেখক ছিলেন। 'মীরাবাঈ', 'জীবন নাটক', 'সোনার সংসার', 'অপরাধ', 'বিদ্যাপতি', 'কামনার আগুন' প্রভৃতি ছবির চিত্রনাট্য যেন এক-একটি উপন্যাস।

পরিচালনার পাশাপাশি তিনি অভিনয়েও ছিলেন সমান পারদর্শী। 'চরিত্রহীন', 'কামনার আগুন' ও 'পঞ্চস্বর' ছবিতে দর্শকেরা তাঁকে অভিনেতা হিসাবে পেয়েছেন। দেবকী বসু নিজে বৈষ্ণব সাহিত্যে শিক্ষিত ছিলেন। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' ছবির অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতেন না। দেবকীবাবু তাঁকে দিনের পর দিন চৈতন্যদেবের কথা বোঝাতে বোঝাতে চরিত্রের গভীরে ঢুকিয়ে দেন। হয়তো সেই কারণেই মহাপ্রভুর চরিত্রে বসন্ত চৌধুরীর অভিনয় অতটা সাবলীল ছিল।

চলচ্চিত্র জীবনে তিনি পেয়েছিলেন সংগীত নাটক আকাদেমি, ভারত সরকারের পদ্মশ্রী। এটা অনস্বীকার্য যে নিউ থিয়েটার্স চলচ্চিত্র-বিষয়ক যত ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছেন তা ভারতে কেন গোটা পৃথিবীতেও বিরল তাঁদেরই অন্যতম দেবকীকুমার বসু। আগামী পর্বে উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটের এইচ বোসের পরিবারের সন্তানের কথা।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৭ এপ্রিল ২০১৭

নতুন বছরে মিষ্টিমুখ

নীলাঞ্জন

লাইট, সাউন্ড, ক্যামেরা, অ্যাকশান...

‘তুমি কিচ্ছু জানো না, বলছি আগে সন্দেশ’

‘না আগে রসগোল্লা’

‘উফ পারি না বাপু, এই দুই বুড়ো পারেও বটে ঝগড়া করতে। খাবে তো বাবা দুটোই’

‘পিসিমা পুজোর জোগাড় সারা একটু দেখে নেবেন...’

‘সব ঠিক আছে বউমা...আরে মধুপর্ক আর রাম...’

‘এই তো পিসিমা মধুপর্ক আর রামবোদে...’

‘হয়েছে হয়েছে, চলো মিষ্টিপুজোটা সেরে আসি বরং, তারপর আবার ঝগড়া করা যাবে।’

সন্দেশ হোক বা রসগোল্লা, বাংলার উৎসবে, আনন্দে, সবার ঘরে নতুন বছরে মিষ্টিমুখ। শুভ নববর্ষ। ভালো থেকো বাঙালি। কাট...।

বাংলা বছরের শুরুর দিনগুলো মিষ্টিময় করে তুলতেই পরিচালকের এই ভাবনা। নিজের একটি কাজে স্টুডিওতে গিয়ে দেখি এডিটিং চলছে। কাজ সেরে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে হল, সত্যিই বাঙালির সেদিনগুলি কী আনন্দময় ছিল। নববর্ষ মানেই নতুন মিষ্টির প্যাকেট হাতে বাড়ি বাড়ি প্রণাম করতে যাওয়া। নতুন বছরের প্রণামের আমি নাম দিয়েছিলাম অদল-বদল মিষ্টি। কলকাতার বিখ্যাত কোনও মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনে আপনি গেলেন প্রিয়জনের বাড়ি। আর সে বাড়ি গিয়ে অন্য আরেক বিখ্যাত দোকানের মিষ্টি খেলেন। হল কিনা অদল বদল? সে যাই হোক, আজ আর তেমন কিছু নেই। আজ সবার ডায়াবেটিস। কানের পাশ দিয়ে সপাটে একটা হাত চলে গেল যেন। কর্কশ একটা গলা বলে উঠল, ‘কে বলেছে নেই? ঘর থেকে বেরোও, যাও দেখো, খোঁজ নাও। আজও নতুন বছরের চেহারাটা তেমনই আছে। যতই রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাক, নতুন বছরে মিষ্টির দোকান ফাঁকা হয়ে যায়।’ সজোরে এই ঝাঁকুনিতে বেরিয়েই পড়লাম। উত্তর কলকাতার পথে পথে ঘুরে খোঁজ করলাম নববর্ষের স্পেশাল মিষ্টির।

যেতে যেতে প্রশ্ন জাগল মনে, মিষ্টির উৎপত্তি কবে এবং কোথায়? আজকের প্রজন্মের আমরা একটু বেশিই যন্ত্রনির্ভর। তাই অন্তরের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অন্তর্জালের (ইন্টারনেট) দ্বারস্থ হলাম। সেখানে দেখা যাচ্ছে মধু ও শুকনো ফল এই দুইয়ের মিশ্রণে পৃথিবীতে মিষ্টির জন্ম হয়। পরবর্তীতে যখন আখ এবং আখের রস থেকে চিনির সৃষ্টি হল তখন মিষ্টির রূপ বদল হয়। আজ আমরা অনেকেই অ্যাপেল পাই খেতে ভীষণ ভালোবাসি। ইউরোপে এই অ্যাপেল পাইয়ের প্রথম জন্ম ১৩৮১ সালে। অনেক পরে নবজাগরণের মাধ্যমে প্রযুক্তির উন্নয়নে আজকের মিষ্টির যে চেহারা সেটি এসেছে। বাংলায় উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রথম জন্ম সন্দেশের পরে রসগোল্লার। দুটোই সমান জনপ্রিয়। উনিশ শতকের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে মিষ্টি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গাড়ি থামল এসে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার স্ট্রিটে। ডানদিকে একটি মিষ্টির দোকান, নাম চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। কবি শঙ্খ ঘোষের মুখে এই দোকানের নাম শুনেছি অনেকবার।

দোকানের দিকে এগিয়ে গেলাম। বেশ কয়েকজন ক্রেতা দাঁড়িয়ে। দু’জন কর্মচারীর সঙ্গে একটি ইয়ং ছেলে। বোঝা গেল তিনিই মালিক। কথা বলে জানা গেল, ১৯০৭ সালে নিতাইচন্দ্র এই মিষ্টির দোকান শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর দুই ছেলে সুমিতসুন্দর ও সুহৃদসুন্দর এই মিষ্টির দোকানের উন্নতিসাধন করেন। বর্তমানে ষষ্ঠ বংশধর এই দোকানের দায়িত্বে আছেন। নতুন বছরে আলাদা করে স্পেশাল কোনও মিষ্টি হয় না, সারা বছরের যে প্রশংসনীয় মিষ্টি হলুদ রসগোল্লা, মালাই চমচম, মধুপর্ক এগুলির খোঁজই ক্রেতারা এসে করেন। আজও নতুন বছরে মিষ্টি কেনার উত্তেজনা একই রকম আছে।

রবিবারের সন্ধে। আমার মিষ্টি অভিযান দিব্য এগোচ্ছে। চিত্তরঞ্জন করে চললুম নকুড়ের মিষ্টির দোকানে। উত্তর কলকাতায় যতবার গেছি, ততবারই এই দোকানের সামনে দিয়ে গেছি। শুনেছি এদের চকোলেট সন্দেশ বেশ খেতে। ১৮৪৪ সালে শ্বশুর ও জামাই মিলে শুরু করেছিলেন ‘গিরিশচন্দ্র দে নকুড়চন্দ নন্দী’ নামে এই মিষ্টির দোকান। হুগলির জনাইয়ের নকুড়চন্দ্র নন্দী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রের কন্যার সঙ্গে। এরপরেই জামাই-শ্বশুরের যৌথতায় রামদুলাল সরকার স্ট্রিটে এই দোকানের গোড়াপত্তন। গল্প শুনলাম, আমাদের ‘বিগ বি’-পুত্র অভিষেক বচ্চনের বিয়েতে নকুড় থেকে গিয়েছিল চকোলেট সন্দেশ, পারিজাত এবং মৌসুমি সন্দেশ। এতই যার নাম সেটি তো এবার চেখে দেখতে হচ্ছে। কিনলাম চকোলেট সন্দেশ। প্রথম কামড়েই মুখ ভরে গেল চকোলেটের সুস্বাদে। ওয়াও...লা জবাব। ও হ্যাঁ, এখানেও সেই একই কথা। নতুন বছর উপলক্ষে কোনও স্পেশাল মিষ্টি তৈরি হয় না। বিখ্যাত মিষ্টিগুলির বিক্রিই বেড়ে যায় সেদিন।

এরপর বেথুন কলেজকে বাঁদিকে রেখে, হেঁদুয়া জলাশয় ছেড়ে, বিবেকানন্দ সোসাইটি পেরিয়ে, আমর্হার্স্ট স্ট্রিট ধরে খানিকটা এগিয়ে রামমোহন কলেজের পাশ দিয়ে গিয়ে বাহাতে ঝামাপুকুর লেনে যাদবচন্দ্র দাশ। ছোট্ট একটি মিষ্টির দোকান। দোকানে দুটি মাত্র মানুষ। একজন কর্মচারী, অন্যজন মালিক। তার কাছ থেকেই জানা গেল আনুমানিক ১৮৩৫-৩৬ সালে বরানগরনিবাসী যাদবচন্দ্র দাশ এই ঝামাপুকুর লেনে রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ির পাশে একটি ছোট্ট চালা ঘরে দোকান শুরু করেছিলেন। তখন এই দোকানের নাম ছিল যদু ময়রা। সেই সময় যাদববাবু এই অঞ্চলেই থাকতেন। সপ্তাহান্তে বাড়ি যেতেন কয়েন ভর্তি ঝোলা নিয়ে, কারণ তখনও নোটের প্রচলন তেমন করে শুরু হয়নি। পরবর্তীতে সেই চালা ঘর থেকে আজকের এই দোকান। নাম হল যাদবচন্দ্র দাশ। বর্তমানে পঞ্চম প্রজন্ম এই দোকানের দেখাশোনা করছেন। সেই সময় রামকৃষ্ণদেব এই যদু ময়রার দোকান থেকে পুজোর জন্য মিষ্টি কিনে যেতেন রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে। নতুন বছরে বেশ অনেক মিষ্টিই তাঁরা বানান। পেস্তা, আবার খাব, চপ সন্দেশ, আনন্দ, দেবযানী, বৈকুণ্ঠ ভোগ, বাদশা ভোগ, বসন্ত বাহার, মধুবন্তী নামক মিষ্টি, নতুন বছরে এই দোকানে গেলে আপনি পেতেই পারেন।

ঘড়ির কাঁটায় তখন সাড়ে সাতটা। যাদবচন্দ্র সেরে চললাম ভীমনাগের উদ্দেশ্যে। এসে উপস্থিত হলাম নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটে। পাশাপাশি দুটি দোকান। ভীমচন্দ্র নাগ ও নবকৃষ্ণ গুঁই। কলকাতা তখন জঙ্গলে ভরা। ১৮২৬ সালে পরানচন্দ্র নাগ শুরু করেছিলেন ভীমচন্দ্র নাগ মিষ্টির দোকান। বর্তমানে ষষ্ঠ বংশধর এই দোকানের মালিক। নতুন বছরে নতুন কোনও মিষ্টি তৈরি হয় না। তবে ভীম নাগে এসে দিলখুশা, মনোহরা ও প্যারাডাইস না কিনে কেউ যান না। দোকান থেকে বেড়িয়েই পাশের দোকানে ঢুকে গেলাম। নবকৃষ্ণ গুঁই। একজন কর্মচারী তখন খদ্দেরকে মিষ্টি দিতে ব্যস্ত। প্রশ্ন করলাম নতুন বছরে স্পেশাল কি হয়? ‘নতুন কিছু করি না, আমাদের প্রচুর অর্ডার থাকে। এছাড়া সারা বছর ধরেই আমাদের এই রামবোঁদে খুব বিক্রি হয়।’ রামবোঁদে দেখে সত্যি জিভে জল এল। ফিরতি পথে গাড়িতে বসে সেই বোঁদে খেতে খেতে যখন বাড়ি ফিরছি উত্তর থেকে দক্ষিণে, চোখে পরল ‘বলরাম মল্লিক ও রাধারমন মল্লিক’। আজকের প্রজন্মের কাছে এই নামটি খুবই পরিচিত। নতুন প্রজন্মের, কেসি দাশের রসগোল্লা না পসন্দ হলেও বলরামের বেকড রসগোল্লা একের অধিক মুখে পুড়লেও পুড়তে পারেন। ১৮৮৩ সালে কোন্নগর থেকে কলকাতায় আসেন গণেশচন্দ্র মল্লিক, তিন বছর মিষ্টির কারিগর হিসাবে কাজ করে ১৮৮৫ সালে ভবানীপুরে তৈরি করেন বলরাম মল্লিক ও রাধারমন মল্লিক। নতুন বছরে শুভ নববর্ষ লেখা সন্দেশ ও পয়লা বৈশাখ লেখা সন্দেশ আলাদা করে বানানো হয়। তাছাড়া সারা বছর ধরেই সন্দেশ নিয়ে নানা রকমের এক্সপেরিমেন্ট চলতেই থাকে।

অবশেষে গন্তব্য যখন বাড়ি, তখন মনে হল রবিবারের সন্ধেটা মন্দ কাটল না। সুরে, নাটকে, কথায়, গল্পে কত কিছুতেই তো কাটে আমজনতার রবিবারের সন্ধে। কিন্তু এমন মিষ্টিময় কাটে কি? তবে বাকি থাকল অনেক চেনা-জানা মিষ্টির দোকানের কথা। সেগুলির খোঁজখবর করে না হয় জানানো যাবে অন্য কোনও সংখ্যায়।

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ - ২২৪১৯০১, ২২৪১৪৯০৪

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১৭ এপ্রিল ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

একটা নাড়ির টান তো আছেই...

শেখাওয়াত পির (কবি ও প্রকাশক)

তিনশো বছরেরও বেশি পুরনো শহর কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী শহরের সাথে বাংলাদেশের মৈত্রীর সম্পর্ক চিরকালীন। আজ দুটি রাষ্ট্রের সংবিধান, আইন এবং জাতীয় সংগীত আলাদা হলেও অতীতে তো ছিল অখণ্ড এক দেশ, এক জাতি। অবিভক্ত সেই দেশ থেকে নদী, মাটি ছিঁড়ে নিয়ে আলাদা মানচিত্র, আলাদা দেশ তৈরি হলেও দুই দেশের মানুষের কলিজা আলাদা হয়নি, আলাদা হয়নি সম্প্রীতির টান। কাঁটাতার বিচ্ছিন্ন করেছে মাটি থেকে মাটিকে, নদী থেকে নদীকে। দুই দেশের সীমারেখাটি যেন একই বাড়ির চৌকাঠের মতো আর সেই চৌকাঠের ওপরে দাঁড়িয়ে দুই দেশের অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু দুই বঙ্গের মানুষের অখণ্ড হৃদয়ের মাঝখানে নেই কোন কাঁটাতার, নেই কোনও সীমান্তরক্ষীর বন্দুক ওঠানো সতর্ক পাহারা, বায়নাকুলারের কঠোর নজরদারি। তাই মনে মনে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উড়ে গেলেও বাস্তবে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া ২০১৩ সালে। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে সেই প্রথম আমার কলকাতায় যাওয়া। সিলেট শাখার পক্ষ থেকে আমরা পাঁচজন যোগ দিতে যাই কলকাতার রাজাবাজারে আয়োজিত দু'দিনের সাহিত্যের মহাযজ্ঞে। সেই সময় বাংলাদেশের আবহাওয়া উত্তাল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে তার প্রভাব পড়েছে। দেশের বাইরে যাওয়ার ভিসা পাওয়া নিয়ে অনেক সমস্যা। অনেক প্রতিকূলতা পার করে আমরা পৌঁছলাম শেষমেশ শহর কলকাতায়। বিকেলের আলো তখন সন্ধের পাদদেশ ছোঁবে ছোঁবে, আমরা পাঁচজন শিয়ালদহের কাছে একটা হোটেলে পৌঁছলাম। পরেরদিন শিয়ালদহ স্টেশনের অনতিদূরেই রাজবাজারে সেই অনুষ্ঠান যার উদ্দেশে এদেশে আসা। কবি নিয়ামত আলি, শিল্পী রোশনারা জাহান, কবি আফজল মাতুব্বর, সাহিত্যিক বোরহান মেহেদি আর আমি এই পাঁচজন সিলেট থেকে অংশ নিয়েছিলাম।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন ভাষা থেকে অংশ নিয়েছিলেন বহু সৃজনশীল মানুষ। বহু শিল্পী-সাহিত্যিক-সৃজনশীল মানুষরা অংশ নিয়েছিলেন আমাদের বাংলাদেশ থেকেও। আমরা যেদিন পৌঁছলাম পরদিন সকাল ৯টা থেকেই সম্মেলন শুরু। সে এক বিরাট আয়োজন। কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানটিতে শুধু বিভিন্ন ভাষাভাষী বয়স্ক মানুষরাই ছিলেন না, তরুণ প্রজন্মের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মত। সম্মেলনটিতে আমরা অংশ নিয়ে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছিলাম।

যাই হোক সেদিনের অনুষ্ঠানে পরিচয় হয় অনেকের সাথেই। তবে বন্ধুত্ব খুব জমে উঠেছিল কলকাতার নিউ আলিপুরের

বাসিন্দা কবি রিতম দত্তের সাথে। আমরা এমনিতেই ৭ দিনের সময় নিয়েই কলকাতা গেছিলাম। অনুষ্ঠানের পরের দিন সকালেই রিতম এসে উপস্থিত সোজা আমাদের হোটেলে, সে দায়িত্ব নেয় আমাদের কলকাতা দেখানোর। প্রথমদিন আমরা গেলাম রবীন্দ্রসদন চত্বরে, ঘুরলাম ভিক্টোরিয়া, বিড়লা প্লানেটোরিয়াম। কলকাতার আরও অনেক বন্ধুদের সাথে আড্ডা হল। সন্ধেবেলা নাটক দেখলাম কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস- এ। সে এক অদ্ভুত মোহময় পরিবেশ মন ভরে যাচ্ছিল। তার পরের দিনে অনেক ঐতিহ্যের সাক্ষী কলকাতার কফি হাউসে গেলাম। রিতমই ওখানে কলকাতার কবিদের একটা কবিতার আড্ডার আয়োজন করেছিল। আমরাও অংশ নিলাম। কেমন করে যে সময়গুলো আমার জীবনের উজ্জ্বল ইতিহাসের পাতায় আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ছিল, বুঝতেই পারছিলাম না। এভাবেই আর দুদিনে ঘুরে ফেললাম কলকাতার উত্তর, দক্ষিণ সহ কলকাতা লাগোয়া বহু জায়গা। মনের মতো, স্মৃতির পটে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখবার মত কত ঘটনা কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। এক কলকাতাতেই এত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে বলার মত না। সায়েন্স সিটি, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা বা ময়দানের পেলব সুন্দর আভিজাত্য তো মনে রাখবার মতই তবে এমন এটা জিনিস দেখতে পেলাম রিতম-এর সৌজন্যে যা জীবনের অনন্য স্মৃতি হয়ে রইল। শিয়ালদা থেকে ৩টে ২৫-এর ট্রেন ধরে আমরা কলকাতা টার্মিনাস-এর উদ্দেশে রওনা হলাম। গঙ্গার পাড় ঘেঁষে রেললাইন চলেছে। ফাঁকা ট্রেন। সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে গঙ্গার বুকে। এ এক অপূর্ব দৃশ্য যে দেখেনি তাকে বুঝিয়ে বলা যাবে না।

এমন অনেক স্মৃতি জমে আছে মনের মণিকোঠায়, উজ্জ্বল আলো হয়ে। আবারও কলকাতা যাব, কারণ কলকাতার সাথে একটা নাড়ির টান তো আছেই। আর কলকাতা শহরটাও আমার হৃদয়ের খুব কাছের।

পুবের ভানু

অরিজিৎ মৈত্র

কথা ছিল ওপার বাংলার ঢাকা শহরে বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের অনুরক্ত পার্শ্বচর হিসাবে দেশের কাজ করবেন সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ১৯৩৯ সালে বড়ভাই মণির মৃত্যুর কারণে দীনেশবাবুর সেই আদেশ পালন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত ঢাকা শহর ছাড়তে বাধ্য হন সরকারি পরওয়ানা নিয়ে। ১৯৪১ সালে চলে আসেন কলকাতায়। জামাইবাবু বাদল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোল অফিসে চাকরি নিয়ে যোগ দেন। জন্ম ১৯২০ সালে অবিভক্ত বাংলার ঢাকার উপকণ্ঠে পাঁচগাও গ্রামে। ম্যাট্রিক পাশ করার পরে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আইএ পাশ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. পড়তেন। শোনা যায় নিজের ক্লাস কেটে ছাত্র সত্যেন বোসের বাংলা ক্লাসে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতেন। কলকাতায় আসার পরে ১৯৪৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করলেন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

বিয়ের চারদিন পরে লোকাচার অনুযায়ী দ্বিরাগমন উপলক্ষে স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন শ্বশুরবাড়ি। নববধূকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি, রাধা ফিল্মস্টুডিও থেকে।' সময় গড়িয়ে চলে। দুপুর পেরিয়ে বিকেল, সন্ধে পেরিয়ে রাত। নতুন জামাই তাও ফেরেন না। বাড়িতে দ্বিতীয় পুরুষ না থাকায় শ্বশুরমশাই স্বয়ং জামাইয়ের খোঁজে গিয়ে হাজির হলেন স্টুডিওতে। গিয়ে দেখেন এক দুর্ভিক্ষ পীড়িত চরিত্রের মেকআপ করে শটের জন্য অপেক্ষা করছেন নতুন জামাই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরু হল চলচ্চিত্রে পথ চলা। পূর্ববঙ্গের সাম্যময় হলেন বাংলা চলচ্চিত্রের পুবের ভানু।

তাঁর সম্পর্কে দীর্ঘ ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। ছায়াছবির রসভাণ্ড ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও পালবংশের প্রবক্তা, আবার কখনও রমাই ভাঁড়। 'সাড়ে ৭৪' মাসিমার কাছে

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবদার করেছেন মালপোয়া খাওয়ার জন্য। আবার দেখি দাদাঠাকুরের কার্তিকেয় ফুলুরি ভাজা ত্যাগ করে হলেন কং জং মি অর্থাৎ কমিশনার জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি। জনপ্রিয় ছবির তালিকা দীর্ঘ। এর মধ্যে রয়েছে '৮০-তে আসিও না', 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'ওরা থাকে ওধারে', 'ডাক্তারবাবু', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', 'পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'সতীর দেহত্যাগ', 'পাশের বাড়ি', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'গল্প হলেও সত্যি' ইত্যাদি। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' ছবির ডাক্তার মামা চরিত্রের অভিনয় ভিন্ন গোত্রের।

একবার যাত্রা সম্মিলনীর কয়েকজন উদ্যোক্তা অধ্যাপক সত্যেন বসুর কাছে গিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানাতে। তিনি বলেন, 'আমি বিজ্ঞানী, আমি গিয়ে কী করব? তোমরা বরং আমার ছাত্র ভানুর কাছে যাও।' এরপর তাঁদের রসগোল্লা খাইয়ে বিদায় করেন। বিদায়পর্বে বলেন, 'আমার কাছে শুধু গোল্লা পেলে, ভানুর কাছে যাও, রসটা পাবে।' প্রোফেসর মাঝে মধ্যেই ফোন করে বলতেন, 'ওরে ভানু আমার মাথাটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, শিগগির আয়, একটু রস ঢেলে আমার মাথাটা ছাড়িয়ে দিয়ে যা।' একবার রাসবিহারী মোড়ে অমৃতায়নে আড্ডাস্থলে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে ওই তল্লাটের ত্রাস নেলো কয়েকজন শাগরেদ সহ তাঁকে প্রশ্ন করে 'এই ছোকরা, তোর নাম কী?' এর উত্তরে অভিনেতা বলেন, 'তুই কে?' জনৈক মস্তান মহাশয় সদর্পে বুক বাজিয়ে নিজের পরিচয় দেন, 'আমি কালীঘাটের নেলো।' শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মুহূর্তে উত্তর দেন,

'আমি ঢাকার ভুলো।' এরপরেই রেস্তোরাঁর কয়লা ভাঙার হাতুড়িটি হাতে তুলে নেন।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নটের অন্যতম ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। রসপিপাসু সাধারণ মানুষ তাঁকে যত আপনার করে নিয়েই থাকুন না কেন, চিন্তাশীল সমালোচকেরা তাঁর অভিনয় নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামিয়েছেন বলে মনে হয় না।' তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না, কারণ তিনি ছিলেন একজন কমিটেড অভিনেতা। কী ছায়াছবিতে, কী নাটকে এবং যাত্রায় তাঁর সাবলীল অভিনয় মনে রাখার মতো। তাঁর কৌতুক নকশার কথাও সর্বজনবিদিত।

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল চৌত্রিশটি বছর বাংলা ছায়াছবির বিদূষকের প্রস্থানের। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। পশ্চিমবাংলার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় একবার বলেছিলেন, জনপ্রিয় এই অভিনেতার সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার জন্য। কিন্তু কী কারণে জানি না, সেটা সম্ভব হয়নি। আজ খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে এবং পরিসরে কিংবদন্তি অভিনেতার সম্পর্কে কিছু লেখার সুযোগ হল।